ধারাবাহিক রচনা

হিমালয়পথে : তমসা উপত্যকা ও অচেনা হানোল

সোমনাথ মুখোপাধ্যায়

দুপুরের বেশ আগেই আমরা সাঁকরি পৌঁছলাম। হোটেল 'স্বর্গারোহিণী প্যালেসে'র সঙ্গে আগেই যোগাযোগ করেছিলাম, সেখানেই উঠলাম। জায়গা অনুযায়ী মনোমতোই বলব—থাকতে থাকতে আরও ভাল লেগেছিল। সবচেয়ে আনন্দ পেয়েছিলাম হোটেলের ঘরে ঢুকে। উপত্যকামুখী ডানদিকের সারা দেয়ালটি স্বচ্ছ কাচের—বাইরে পাহাড়ের কোলে বিশাল সবুজ উপত্যকা আদিগন্তবিস্তৃত। পায়ে পায়ে বেরোলাম দ্বিপ্রাহরিক আহারের উদ্দেশ্যে। খুব একটা বাছাবাছির সুযোগ নেই। কয়েকটি দোকান, দু-একটি খাওয়ার জায়গা, থাকার জায়গাও খুব বেশি নেই। মোটামুটি একই মাপের একটি হোটেল দেখলাম, পরে কয়েকটি ছোট-বড় হোম-স্টেও চোখে পড়েছে। তবে সেগুলিতে মূলত তাঁরাই থাকেন যাঁরা ট্রেকিং করতে আসেন। সাঁকরি থেকে মানুষ হিমালয়ের অন্দরে বিভিন্ন দিকে যান, তার মধ্যে সবচেয়ে পরিচিত স্বর্গারোহিণী ট্রেক; সবচেয়ে বেশি অভিযাত্রী সেখানে যাওয়ার জন্যই আসেন এখানে। এছাড়া আছে কেদারকণ্ঠ, ব্ল্যাক পিক, রুইসারাগার্ড, বালিপাস ইত্যাদি। গ্রীষ্মে গিয়েছিলাম, তাই বেশকিছু দেশি-বিদেশি পর্বত অভিযাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। খাওয়ার জায়গা হিসেবে বেছে নিয়েছিলাম আমাদের হোটেলের উলটোদিকে 'রিঙ্কি ভোজনালয়'। রাস্তা থেকে সিঁড়ি উঠে গেছে দোকান অবধি, সেখানে নেপালি তরুণী জ্যোতি আর একজন পুরুষ রান্না ও খাওয়ার সবদিক সামলায়। কয়েকটি টেবিল-চেয়ার সাজানো আছে, কাপড়ের পর্দার আড়ালে রান্নাঘর, আমরা ছাড়া যে-কয়েকজন সেখানে ছিল তারা সবাই স্থানীয়।

স্বর্গারোহিণী ট্রেক

যাত্রার ধকলের কারণে দুপুরে একটু বিশ্রাম নিয়েই বেরোলাম বিকেলে। সাঁকরির মানচিত্রের একটু বর্ণনা দিই। নৈটোয়ারের দিক থেকে যে-রাস্তায় এসেছি সেই রাস্তার বাঁদিকে আমাদের হোটেল। এই

পাহাড়ের কোলে সাঁকরি গ্রাম

রাস্তা হোটেল থেকে সামান্য এগিয়ে ডানদিকে বাঁক নিয়েছে, তার কিছুটা পরেই সংরক্ষিত বনাঞ্চলে প্রবেশের তোরণ। হোটেল থেকে সেই তোরণের দূরত্ব মোটামুটি আড়াইশো মিটার। তারই ভিতর দিয়ে রাস্তা চলে গেছে ওসলা হয়ে হর-কি-দুন ও অন্যান্য কিছু ট্রেকিংয়ের। আকাশ পরিষ্কার থাকলে কাছেই শুভ্র স্বর্গারোহিণী শিখর সারাদিন সাঁকরির সর্বত্র দৃশ্যমান। হোটেলের উলটোদিকে পাহাড়ের দেওয়াল। সাঁকরিতে পরিবারের সংখ্যা আনুমানিক সওয়াশো মতো হবে। পাহাড়ের গায়ের কয়েকটি বাড়ির বসবাসকারীদের ছেড়ে দিলে এখানকার বাকি সবার বাড়িগুলি রাস্তা থেকে নিচের দিকের উপত্যকা অংশে ছড়িয়ে আছে। আপেল ইত্যাদির বাগানগুলিও তাই। কাছেই সুপ্রাচীন গ্রাম সওর বা সউর। গ্রামে ঢোকার রাস্তা দুটি। প্রথমটি বনাঞ্চলে প্রবেশ-তোরণের ঠিক আগেই বাঁদিকে একটি পায়ে চলা পথ, নেমে গেছে গ্রামের দিকে। এছাড়া তোরণ দিয়ে প্রবেশের পরও বাঁদিকে গ্রামের দিকে যাওয়ার রাস্তা আছে। আমরা তোরণ পার হয়ে যাওয়ার সময়েই দেখলাম আমাদের দেখে স্থানীয় দুজন স্বল্পবয়সি মহিলা কৌতূহলী দৃষ্টিতে রাস্তার একধারে দাঁড়ালেন। আমরাও দাঁড়ালাম। যিনি কিছুটা সপ্রতিভ, তিনিই সহজ প্রশ্নটি করলেন—আমরা কোথা থেকে এসেছি। এরপর স্বচ্ছন্দে কিছু কথা চলল। সেই সুযোগে আমরাও জেনে নিলাম নিচে যে-দেবালয়টি দেখা যাচ্ছে সেখানে যাওয়ার রাস্তা। যেহেতু সাঁকরির লোকসংখ্যা খুবই কম, তাই পরেও আমাদের লক্ষ্যহীন ঘোরাফেরার মধ্যে এই দুজনের সঙ্গে দেখা হয়েছিল—তখন দুজনের মুখেরই হাসির ধরন পালটেছে, আমরা যেন তাঁদের পরিচিত প্রতিবেশী। আসলে এখানকার মানুষ এককথায়—অন্যরকম, মিশলে আনন্দ পাওয়া যায়।

জেনে-নেওয়া পথটি দিয়ে যে-দেবালয়ে গিয়ে পৌঁছলাম সেটি সওর গ্রামের প্রধান মন্দির—সোমেশ্বর দেবতার। প্রশস্ত আঙিনার মধ্যে বেশ বড় মন্দির। চতুর্দিক নিরালা, মন্দির বন্ধ। মন্দিরের চেহারা আমাদের এযাবৎ দেখা হিমালয়ের অন্যান্য মন্দিরের থেকে আলাদা। তবে পরে যখন টন্‌স উপত্যকার এই অংশে ঘুরেছি, দেখেছি সব মন্দিরের স্থাপত্যই এইরকম। তফাত আঙিনার ও মন্দিরের মাপে, এবং মন্দিরের কারুকার্যের বৈচিত্র্যে। একটি সাধারণ আন্দাজ দিতে হলে বলব—বেশিরভাগ মন্দিরের মাপই আয়তক্ষেত্র এবং চারিদিকে বেশ প্রশস্ত আঙিনা। মূলত দেবদারু কাঠ ও পাথর দিয়ে দেয়ালগুলি তৈরি, প্রবেশমুখে তারই সঙ্গে চকচকে ধাতুর ব্যবহার। মাথায় সমান আকারের পাতলা পাথরের আচ্ছাদন, মাঝখান থেকে দুধারে চালার ঢঙে নেমে গেছে। সেই দুটি ধার ওপরে যেখানে মিলেছে তার ওপর সার দিয়ে ছোট-বড় পশুপক্ষীর মূর্তি। পিছনে গর্ভগৃহ অংশের মাথায় পিছনদিকে দু-থাকের চূড়া—প্রথমটি বড়, তার উপরেরটি ছোট এবং আলংকারিক ধরনের। মন্দিরের সারা গায়ে ও প্রবেশমুখে কাঠের উপর নিপুণ খোদাই-শিল্প

সোমেশ্বর মন্দির

দেখবার মতো। মন্দির বন্ধই ছিল সেসময়। শুনেছি কিছু দূরে জাখোল গ্রামে মূল সোমেশ্বর মহাদেবের আবাস। তিনি কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর এলাকার বাইশটি গ্রাম সফর করবেন এবং প্রত্যেক গ্রামে কিছুদিন করে থাকবেন। সওর গ্রামেও আসবেন, অধিবাসীরা তখন তারই প্রতীক্ষায়। আগেই পড়েছিলাম সওর অত্যন্ত প্রাচীন গ্রাম। দেখলাম সে-চিহ্ন বাড়িঘরের মধ্যে সুস্পষ্ট। গ্রামে ঘুরতে হলে বিভিন্ন বাড়ির মাঝখানের আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে নেমে যেতে হয়। বেশ কিছুটা গিয়ে দেখেছি প্রায় সব বাড়ি কাঠের এবং অত্যন্ত প্রাচীন ধরনের। যেখানে বাড়ির সঙ্গে সংযোজন করা হয়েছে সেটিও সাবেক ধরন বজায় রেখেই হয়েছে। বড় বা মাঝারি মাপের বাড়ির বারান্দা ও জানলায় কারুকার্য বাড়িগুলিকে ভারি আকর্ষণীয় করে তুলেছে। দাঁড়িয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়। আশ্চর্যের যে এই বাড়িগুলি এখানকার মানুষ কাঠ জোগাড় করে নিজেরাই তৈরি করে নেন। দু-একটি জায়গায় এ-ঘটনা নিজের চোখেই দেখলাম। এছাড়াও সাঁকরিতে কয়েকটি ঘটনার কথা খুব মনে আছে, সেগুলির মধ্যে কয়েকটি বলব।

প্রথমদিন বিকেল। ছবি তুলতে একটু একা হয়ে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখি আমার সঙ্গী একটি বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গল্পে মত্ত। আমি যেতেই শুনলাম সবাই আমার জন্যই অপেক্ষা করছে, ভিতরে যেতে হবে—চায়ের আমন্ত্রণ। বিকেলের আলোয় বাড়ির সামনের অংশটিকেই খুব ভাল লাগছিল, বললাম চা-পান এখানে দাঁড়িয়েই হোক। কথাবার্তায় অগ্রণী ভূমিকায় বছর ছাব্বিশ-সাতাশের একটি সপ্রতিভ মেয়ে, চেহারাটি ভারি আকর্ষণীয়। সঙ্গে রয়েছে তার ভাই, দেরাদুনে ডাক্তারি পড়ে; আর এক বোন, ষষ্ঠ শ্রেণিতে পাঠরত। তাদের বাবা-মা গেছেন ক্ষেতের কাজে, কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরবেন। কথার ফাঁকে মেয়েটি নিজে চা করে নিয়ে এল। নিজেদের কথা বলল, আমাদের কথাও শুনল, বেড়াবার কথাও। দিদিটি কী করে জানতে চাইলে সে একটি সুন্দর কার্ড এগিয়ে দিল, তাতে তার নাম, পেশা, মোবাইল, ই-মেল সব হদিশ দেওয়া আছে। দেখলাম সে স্নাতকস্তর অবধি পড়া সাঙ্গ করে এখন গ্রুপ-ট্রেকিং করায়—অর্থাৎ পারিশ্রমিকের বিনিময়ে পদযাত্রীদের অভিযানে নিয়ে যায়। এই পেশায় এখানকার বহু যুবক নিযুক্ত আছে দেখেছি, অনেকের সঙ্গে পরিচয়ও ঘটেছে। কিছুটা ঘনিষ্ঠতার পর তাদের কেউ কেউ আমায় হর-কি-দুন বা কেদারকণ্ঠ নিয়ে যেতেও চেয়েছে। আশ্চর্যের যে এই মেয়েটিও সেকথাই বললে। তার আন্তরিক আবদার : ''আংকল আপনি সামনের বছর আসুন,

আন্টি আমাদের বাড়িতে থাকবেন, আপনি আমার সঙ্গে হর-কি-দুন যাবেন।" ভাবলাম ধন্য হিমালয়, ধন্য সাঁকরি—ভাগ্যিস এসেছিলাম, তাই এই মেয়ের দেখা পেলাম। শেষ বিকেলের আলোয় হোটেলে ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম, এমন আরও কত মেয়ে নিশ্চয় আছে হিমালয়ে।

কখনও কখনও নৈটায়ারের দিকেও হাঁটতাম। সোজা রাস্তা, বেশ কিছুটা গিয়ে ডানদিকে বাঁক নিয়েছে। যাওয়ার সময় বাঁদিকে পাহাড়ের গায়ের বাড়িগুলি, তাদের ঘরসংসারের চলচ্চিত্র তাকিয়ে দেখতাম—ভাল লাগত। কিছুটা গিয়ে রাস্তার ডানদিকে একটি ভোজনালয়। সেখানে সকাল-সন্ধ্যা ব্যস্ত-হাতে এক মহিলাকে দেখেছি। বিকেলের দিকে তিনি কিছুটা হালকা থাকতেন, বৈকালিক চা-পান তাঁর কাছেই সেরেছি কদিন—নিজের জগতের কথা শোনাতেন আমাদের। দেরাদুন থেকে প্রত্যহ দুটি বা তিনটি বাস আসত সাঁকরিতে। শেষ বাসটি বিকেল চারটে বা তার কিছু পরে পৌঁছয়। সবগুলিই এই দোকানের কাছেই দাঁড়িয়ে থাকে রাত্রে। বাসের লোকজনও এই দোকানেই খাওয়াদাওয়া করত। অলস বিকেলে চায়ের ফাঁকে তাদের সঙ্গেও গল্প করতাম। বাসগুলি ফিরে যেত পরের দিন, প্রথমটি একদম কাকভোরে। ছাড়ার কিছু আগে থেকে হর্ন বাজিয়ে মানুষকে সজাগ করত, হোটেলের বিছানা থেকে শুনতে পেতাম। ভারি ভাল লাগত যখন চলে যাওয়ার পর তার চলমান ইঞ্জিনের আওয়াজ ধীরে ধীরে পাহাড়ের বাঁকে মিলিয়ে যেত। দ্বিতীয় দিন থেকে বিছানা ছেড়ে হোটেলের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতাম। আঁধারমাখা ভোরে দেখতাম বাসটির অপস্রিয়মাণ চেহারা।

বিকেলের চায়ের পাট শেষ করে আমরা রাস্তা ধরে আরও এগিয়ে যেতাম। সোজা রাস্তায় খানিক হেঁটে গিয়ে পৌঁছতাম যেখান থেকে রাস্তা বাঁক নিয়ে আবার সোজা চলে গেছে নৈটায়ারের দিকে। ডানদিকে আপেল ইত্যাদি ফলের লম্বা বাগান, রাস্তার বাঁদিকে পাহাড়ের গায়ে পিচ, খোবানি, চুসনি—এমন সব ফলের গাছ। একদিন বিকেলে হাঁটছি, তিনটি কমবয়সি মেয়ে নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে পাশ দিয়ে হেঁটে এগিয়ে গেল। তারপর দেখলাম বেশ কিছুটা গিয়ে তারা দূরে বাঁদিকের পাহাড়ের গায়ে উঠে গেল। আমরা ধীর গতিতে এখানে দাঁড়াই, ওখানে কথা বলি—করতে করতে যখন প্রায় পথের সেই বাঁকের কিছুটা আগে, দেখলাম তিন বন্ধু মিলে পথের ধারে একটি সিমেন্টের স্ল্যাবে বসে মহাফুর্তিতে গল্প করছে আর কোঁচড় থেকে ছোট ছোট কী-এক ফল বার করে মুখে দিচ্ছে, তারপর দানাগুলিকে দূরে দূরে ফেলে দিচ্ছে। আমাদের দেখে তারা ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল, এগিয়ে গেলাম তাদের কাছে। আমার সঙ্গীর আগ্রহী প্রশ্ন : ''কী খাচ্ছিস তোরা?'' তিনজনই হাত মেলে একসঙ্গে তাদের ঐশ্বর্যের হদিশ দিলে—সদ্য গাছ থেকে পেড়ে আনা চুসনি ফল। তাদের রসদ তখন প্রায় শেষ, এবং আমার সঙ্গীর আগ্রহের আন্দাজ তারা পেয়েছে। হঠাৎ তাদের দুজন এক ছুটে গিয়ে পাশেই পাহাড়ের গায়ে উঠে গেল—বুঝলাম ফল পাড়তে গেছে। অন্যজন বসেই রইল। সে কিছুটা শান্ত বলে মনে হল, স্বল্পবাকও বটে। কারণটিও জানতে দেরি হয়নি। অল্প কথাতেই জানা গেল যে সে সাঁকরি গ্রামের মেয়ে নয়, তার বাড়ি বেশ কিছুটা দূরের এক গ্রামে। সাঁকরিতে সে থাকে স্কুলে পড়ার জন্য। তবে সে একা নয়, তার ছোট ভাইও থাকে তার কাছে। সে পড়ে ক্লাস সেভেনে, ভাইটি থ্রিতে। সাঁকরিতে একটি ঘর নিয়ে তারা দুজনে থাকে। রান্নাবান্না ও ভাইকে দেখাশোনা ইত্যাদি সব তারই দায়িত্ব। বাবা নৈটায়ারে পোস্ট অফিসে পিওনের কাজ করেন, সেখানেই থাকেন সারা সপ্তাহ। সপ্তাহশেষে বাড়ি ফেরার পথে ছেলেমেয়ের কাছে ঘুরে যান, তাদের প্রয়োজনের দিকটি দেখেন

এবং ছুটি থাকলে গ্রামে নিয়ে যান এক- দুদিনের জন্য। ফেরার সময় আবার দুজনকেই এখানে রেখে যান। মেয়েটি যখন এইসব বলছিল, একমনে তাকিয়ে ছিলাম তার দিকে। কোনও অভিমান নয়, মন খারাপ নয়—শুধু বললে, ''বলুন, এছাড়া তো আমাদের পক্ষে পড়াশোনা করা সম্ভব নয়!'' সেই পড়ন্ত বিকেলে, নির্জন সাঁকরির রাস্তায় ছোট্ট মেয়েটির দিকে তাকিয়ে খুব আপ্লুত হয়েছিলাম। বিস্মিত হয়েছিলাম সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে মেয়েটির পরিবারের চিন্তার ঔদার্য দেখে। আমাদের শহুরে প্রগতির মাপকাঠি দিয়ে এই ঔদার্যের পরিমাপ করা অসম্ভব। হিমালয়ের প্রত্যন্ত গ্রামের এতটা উদার মনোভাব অবশ্যই এক সার্বিক পরিবর্তনের আশা জাগায়।

স্বর্গারোহিণী প্যালেস হোটেলের তিনতলার ছাদটি আমাদের খুব প্রিয় ছিল। বেশ বড় ছাদ। নৈটোয়ারের দিক থেকে আসা রাস্তাটি হোটেলের সামনে দিয়ে চলে গেছে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের দিকে—যেদিকে হর-কি-দুন যাওয়ার রাস্তা। হোটেলের পিছন ও দুধারে পাহাড়ের কোলে বাড়িঘর ও সাঁকরির বিস্তৃত উপত্যকা। দুপুর থেকে প্রায় বিকেল অবধি চেয়ার নিয়ে বসে থাকতাম সেই ছাদে। আর একটি আকর্ষণও ছিল। অভিযান শেষে বেশিরভাগ অভিযাত্রী সেই সময়টিতেই ফিরত। সফল অভিযানের আনন্দ তাদের ক্লান্ত চোখেমুখে স্পষ্ট। এই ছাদে বসেই তারা সাধারণত খাওয়াদাওয়া সারত। পরিবেশন করতেন তাঁদের ট্যুর প্যাকেজের গাইড—সেটি রান্নাও করতেন তিনি। সাঁকরি বা নিকটবর্তী অঞ্চলের বেশ কিছু যুবক এই পেশায় সাফল্যের সঙ্গে নিযুক্ত। এদের অনেকের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমাদের খুবই ভাল লেগেছে। দেখেছি চলে যাওয়ার আগে ট্যুর গাইডকে বিদায় জানাবার সময় তরুণ অভিযাত্রীরা অনেকেই বিষণ্ণতা বোধ করে। পরদিন ভোরে এরা ছোট রিজার্ভ বাসে বা জিপে দেরাদুনের পথে নেমে যেত। আবার দুপুর বা বিকেলে আর একদল আসত হইহই করতে করতে,—মুখ প্রত্যাশায় ভরপুর। কখনও দেখেছি চেনা বন্ধুরা দল বেঁধে এসেছে, কখনও বিভিন্ন রাজ্য থেকে ভ্রমণপ্রিয় মানুষ অনলাইন বিজ্ঞাপনে আকৃষ্ট হয়ে দেরাদুন পৌঁছে দল বেঁধেছে। সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং নানা ভাষাভাষী মানুষের দলে কয়েকজন তরুণীকে দেখে এবং সবার সঙ্গে হইহই করে তাদেরও দুর্গম অঞ্চলে পাড়ি দিতে দেখে খুব আনন্দ হত। সেই ছাদে সবাই মিলে নিজেদের আনন্দ আর স্মৃতি ভাগ করে নিতাম—এক-এক দিন এক-এক দলের সঙ্গে। কেউ কেউ চলে যাওয়ার সময় আমাদের প্রণাম করত। ছাদটি তাই আমাদের কাছে অখণ্ড ভারতবর্ষের অনুভূতি বয়ে আনত।

সাঁকরিতে পৌঁছবার পরদিন সকালে আমরা জাখোল গ্রাম দেখতে গিয়েছিলাম। সাঁকরি থেকে ঊনত্রিশ কিলোমিটার। গাড়োয়াল হিমালয়ের সঙ্গে যমুনা তটবর্তী অঞ্চলের, বিশেষত টন্‌স উপত্যকার ঊর্ধ্বাংশের অধিবাসী, বাড়িঘর, এমনকী দেবতা ও মন্দির—সবকিছুর মধ্যেই চেহারা-চরিত্রে, ধর্মীয় বিশ্বাসে, জীবনযাত্রায়, আচার-আচরণে বিশেষত্ব আছে। আমি শহর-সমতলের মানুষ—দৃষ্টিকোণের সীমাবদ্ধতা আছে মানি। কিন্তু গাঙ্গেয় হিমালয়ের সঙ্গে টন্‌স উপত্যকার পার্থক্য স্পষ্ট অনুভব করেছি। এই অনুভূতির শুরু হানোলে। তারপর যত এগিয়েছি—নৈটোয়ার ও সাঁকরিতে সেটি আরও দৃঢ় হয়েছে। অবশেষে জাখোল পৌঁছে একটি গ্রহণযোগ্য চিত্র পেয়েছি। পৌঁছতে ঘণ্টা দেড়েক লাগে। জাখোলে ঢোকার আগে রাস্তাটি ডানদিকে ঘুরে ওপরে উঠে গেছে। বাঁকের মুখে বাঁহাতি একটি চা ইত্যাদির দোকান। ঝুপড়ির মতো সেই দোকানের পিছনে আদিগন্ত ধু-ধু উপত্যকা আর সুউচ্চ হিমালয় ফ্রেমে-বাঁধানো ছবির মতো। বাঁক নিয়ে ডানদিকের চড়াই রাস্তা ধরে পৌঁছে গেলাম জাখোল। *ক্রমশ*